লাস্ট থ্রি মিনিটস

অষ্টম অধ্যায়: ধীর গতির জীবন

১৯৭২ সালে *ক্লাব অব রোম* নামে একটি সংগঠন মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে *দ্য লিমিটস টু গ্রোথ* একটি নেতিবাচক পূর্বাভাস প্রকাশ করে। তারা আসন্ন বিভিন্ন দূর্যোগ বিষয়ক অনেকগুলো আশঙ্কা প্রকাশ করে এতে। এর মধ্য অন্যতম ছিল জীবাশ্ম জ্বালানি বিষয়ক। তাদের মতে, অল্প কয়েক দশকের মধ্যে পৃথিবীর সব জীবাশ্ম জ্বালানি ফুরিয়ে যাবে। মানুষ ভয় পেল। তেলের দাম গেল বেড়ে। বিকল্প জ্বালানি নিয়ে গবেষণা গতি পেল। এখন আমরা ১৯৯০ এর দশকে আছি।১ কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ার লক্ষ্মণ এখনও কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। ফলে ভয়ের বদলে এখন সবার মনে রয়েছে পরিতৃপ্তি। দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, সরল গাণিতিক হিসাব বলছে, সম্পদের সসীম পরিমাণ চিরকাল যাবত নির্দিষ্ট হারে কমতে থাকতে পারে না। আজ হোক, কাল হোক, জ্বালানি ঘাটতির মুখোমুখি আমাদেরকে হতেই হবে। পৃথিবীর জনসংখ্যা সম্পর্কেও একই কথা খাটে। অনির্দিষ্ট সময় ধরে এটা অব্যাহত থাকতে পারে না।

জেরেমিয়া ধর্মীয় গোষ্ঠীর কিছু কিছু মানুষ মনে করে,ও আসন্ন জ্বালানি সঙ্কট ও অতিজনসংখ্যার ফলে মানুষ একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে জীবাশ্ম জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে গেলেই মানুষেরও অবসান ঘটে যাবে বলা যাচ্ছে না। আমাদের চারপাশে জ্বালানির বিপুল উৎস রয়েছে। অবশ্য সেটা কাজে লাগানোর মতো বুদ্ধিমত্তা থাকা চাই। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, আমাদের যতটুকু শক্তি দরকার সূর্যের আলোতে তার চেয়ে বেশি শক্তি রয়েছে। আরেকটি বড় সমস্যা আছে। হয়ত জনসংখ্যার বৃদ্ধি আমরা কমানোর আগেই খাদ্যাভাবে সেটা এমনিতেই কমে যাবে। এর জন্যে বৈজ্ঞানিক কৌশলের চেয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কৌশল বেশি প্রয়োজন। তবে আমার বিশ্বাস, জীবাশ্ম জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে শক্তির যে ঘাটতি তৈরি হবে সেটার সমাধান করা গেলে এবং আমাদের গ্রহের বাস্তুগুত ও গ্রহাণুর আঘাতজনিত ক্ষতি কমিয়ে আনা গেলে মানুষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। মানবজাতির ভবিষ্যতকে সীমিত করার মতো স্পষ্ট কোনো নিয়ম প্রকৃতিতে চোখে পড়ছে না।

আগের অধ্যায়গুলোতে আমি বলেছি কীভাবে অসম্ভব দীর্ঘ সময় পরে মহাবিশ্বের কাঠামো বদলে যাবে। সাধারণত এর মাধ্যমে ধীরগতির ভৌত প্রক্রিয়ার প্রভাবে মহাবিশ্ব নিজের বৈশিষ্ট্যগুলো হারাবে। পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব আছে প্রায় ৫০ লক্ষ বছর হলো (এটা নির্ভর করে মানুষের সংজ্ঞার ওপর)। আর সভ্যতার সূচনা কয়েক হাজার বছর আগে। এখন থেকে আরও দুই বা তিন শ কোটি বছর পৃথিবী বাসযোগ্য থাকবে। তবে জনসংখ্যা অবশ্যই কমে যাবে। সময়টা এত দীর্ঘ যে সেটা কল্পনা করাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একে এতই বড় মনে হয় যে সেটাকে বাস্তবে অসীম সময় বলে মনে হয়। তবুও আমরা দেখেছি, মহাবিশ্বের বিবর্তনের জন্যে যে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় সে তুলনায় এক শ কোটি বছরও খুব নস্যি। আরও বিলিয়ন বিলিয়ন বছর পরেও আমাদের ছায়াপথের অন্য কোথাও পৃথিবীর মতো আবাস থাকতেই পারে।

আমরা কল্পনা করতেই পারি আমাদের বংশধররা এত সময় হাতে পেয়ে মহাশূন্যে ছুটে বেড়াবে। বানাবে সব ধরনের বিস্ময়কর যন্ত্রপাতি। সূর্য পৃথিবীকে পুড়িয়ে ফেলার আগে আগে পালানোর যথেষ্ট সময় তারা পাবে। খুঁজে নিতে আপ্রবে অন্য এক গ্রহ। তারপর আরেকটি। তারপর আরেকটি। মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়লে জনসংখ্যাও বাড়বে। এটা জেনে কি আমরা আশ্বস্ত হচ্ছি যে বিংশ শতকে আমাদের টিকে থাকার লড়াই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ নাও হতে পারে?

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি বলেছি, বার্ট্রান্ড রাসেল তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের ফলাফল নিয়ে হতাশাচ্ছান্ন ছিলেন। যন্ত্রণা নিয়ে তিনি লিখেছিলেন, যেহেতু সৌরগজগৎ এক সময় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তাই মানুষের অস্তিত্বও একসময় নিষ্ফল হবে। রাসেল স্পষ্ট অনুভব করেছিলেন, আমাদের বাসস্থানের স্পষ্ট অনিবার্য মৃত্যু কোনোভাবে মানবজীবনকে অর্থহীন কিংবা প্রহসনে পরিণত করেছে। এটা নিশ্চিত এই বিশ্বাস তাকে নাস্তিক বানানোর পথে অবদান রেখেছে। ব্ল্যাকহোলের মহাকর্ষীয় শক্তি সূর্যের বহুগুণ বেশি এবং সৌরজগৎ তছনছ হয়ে যাওয়ারও লক্ষ লক্ষ কোটি বছর পর্যন্ত টিকে থাকবে জানলে কি তিনি আরেকটু ভাল অনুভব করতেন? আসলে সময়টা কত দীর্ঘ সেটা মূখ্য নয়। মূল বিষয় হলো, আজ হোক, কাল হোক, মহাবিশ্ব এক সময় বাসের অযোগ্য হয়ে যাবে। এ কারণে কেউ কেউ মনে করেন, আমাদের অস্তিত্ব অর্থহীন।

সপ্তম অধ্যায়ের শেষে মহাবিশ্বের দূর ভবিষ্যতের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। হয়ত আমরা ধরে নিতে পারি, আরও কম পরিবর্তনযোগ্য ও বেশি বৈরি পরিবেশ তৈরি হবে না বললেই চলে। তবে আমাদের ভাবনাই যে সঠিক সেটা ধরে নেওয়া যাবে না। আবার হতাশও হওয়া যাবে না। ইলেকট্রন ও পজিট্রন দিয়ে গড়া এক পাতলা স্যুপের মতো মহাবিশ্বে বাস করা মানুষের পক্ষে নিঃসন্দেহে কঠিন হবে। তবে আমাদের কথা সেখানে নয়। অবশ্যই মানব প্রজাতি অমর কি না আমরা সেটা নিয়ে কথা বলছি না। আমাদের বংশধররা টিকে থাকতে পারবে কি না সেটা বলছি। আর আমাদের বংশধররা যে মানুষই হবে তার সম্ভবনাও কম।

জীবের বিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবীতে হোমো স্যাপিয়েন্সদের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু আমাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে বিবর্তন প্রক্রিয়া খবু দ্রুত বদলে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আমরা হস্তক্ষেপ করে ফেলেছি। মিউটেশন বা পরিব্যক্তিকেও নিয়ন্ত্রণ করা দিন দিন সহজ হয়ে যাচ্ছে। জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যেম খুব দ্রুতই হয়ত আমরা ইচ্ছেমতো গুণ ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যেসম্পন্ন মানুষ বানাতে পারব। জৈবপ্রযুক্তির এই সম্ভাবনাগুলো মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে তৈরি হয়েছে। একবার ভাবুন, হাজার হাজার বা লক্ষ বছরের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চার মাধ্যমে কী সম্ভব হতে পারে।

মাত্র কয়েক দশকেই মানুষ গ্রহ থেকে বের হয়ে নিকট মহাকাশে পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম হয়ত পৃথিবী ছাড়িয়ে সৌরজগতের আরও দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়বে। তারপর যাবে ছায়াপথের অন্য নক্ষত্রে। অনেক সময় মানুষ ভুল করে মনে করে, এ কাজ করতে অসীম সময় লাগবে। আসলে তা নয়। বসতি গড়ার প্রক্রিয়াটি হয়ত হবে বারবার গ্রহান্তরের মাধ্যমে। বসতিস্থাপনকারীরা পৃথিবী ছেড়ে কয়েক আলোকবর্ষ দূরের অন্য কোনো উপযুক্ত গ্রহে ঠাঁই নেবে। আলোর কাছাকাছি বেগে চলতে পারলে তাতে সময় লাগবে মাত্র কয়েক বছর। আমাদের বংশধররা আলোর এক ভাগের মতো যথেষ্ট গতি অর্জন করতে না পারলেও ভ্রমণে সময় লাগবে মাত্র কয়েক শ বছর। নতুন একটি বসতি পুরোপুরি গড়ে তুলতে হয়ত আরও কয়েক শ বছর লাগবে। ততক্ষণে নতুন কোনো গ্রহের সন্ধানে এক দল অভিযাত্রীকে পাঠিয়ে দেওয়ার চিন্তা করা যাবে। আরও কয়েক শ বছর পরে সেই গ্রহেও বসটি গড়ে ওঠবে। এভাবেই চলতে থাকবে। পলিনেশীয়রা মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দ্বীপগুলোতে এভাবেই বসতি নির্মাণ করেছিল।

ছায়াপথকে অতিক্রম করতে আলোর এক লক্ষ বছর সময় লাগে। আলোর বেগের এক ভাগ বেগে চললে তাতে সময় লাগবে এক কোটি বছর। এই যাত্রাপথে এক লক্ষ গ্রহে বসতিস্থাপন করা গেলে এবং প্রতিটির জন্যে দুই শ বছর লাগলে পুরো ছায়াপথে বসতি গাঁড়তে ছায়াপথ পার হবার সময়ের তিনগুণের বেশি সময় লাগবে না। তবে মহাকাশ বা ভূতাত্ত্বিক মাপকাঠির তুলনায় এক কোটি বছর খুব অল্প সময়। সূর্য পুরো ছায়াপথকে একবার ঘুরে আসতে প্রায় ২০ কোটি বছর সময় নেয়। এর অন্তত ১৭ গুণ সময় ধরে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব আছে। সূর্যের বার্ধ্যকের কারণে পৃথিবী বিপদে পড়তে মাত্র দুই না দিন শ কোটি বছর লাগবে। ফলে আরও তিন কোটি বছরে খুব অল্প পরিবর্তনই ঘটবে। তার মানে বলতে চাচ্ছি, পৃথিবীর বুকে প্রযুক্তিগত সভ্যতা গড়ে উঠতে যতটুকু সময় লেগেছে, পুরো ছায়াপথে বসতি গড়তে তার খুব সামান্য ভগ্নাংশের সমান সময় লাগবে।

বসতি গড়ে তোলা আমাদের এই বংশধররা কেমন হবে? কল্পনার ঘোড়াকে ইচ্ছেমতো ছুটতে দিলে আমরা ধারণা করতে পারি, জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে তারা কাঙ্ক্ষিত গ্রহের পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারবে। একটি সরল উদাহরণ চিন্তা করি। ধরা যাক, এপসাইলন এরিডানি নক্ষত্রের চারপাশে ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর মতো একটি গ্রহ পাওয়া গেল। দেখা গেল, এর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন আছে মাত্র ১০%। তাহলে অধিবাসীদের দেহকে পরিবর্তন করে লোহিত রক্তকণিকা বাড়াতে হবে। গ্রহটির পৃষ্ঠের মহাকর্ষ বেশি হলে অধিবাসীদের দেহকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। হাড়কেও শক্ত করতে হবে। এভাবেই সবকিছু বদলে নিতে হবে।

এই ভ্রমণের জন্যে যা যা লাগবে তাতে সমস্যাও হওয়ার কথা নয়। যদি তাতে কয়েক শ বছর লাগে তবুও নয়। মহাকাশযানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে বানানো যেতে পারে। যা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অভিযাত্রীদেরকে কয়েক প্রজন্ম ধরে আবাসন দিতে সক্ষম হবে। আবার অভিযাত্রীদেরকে ভ্রমণের সময় তীব্র ঠাণ্ডা পরিবেশে জমিয়ে রাখা যেতে পারে।২ সত্যি বলতে, ছোট একটি যানে অল্প কিছুসংখ্যক কর্মীসহ লক্ষ হিমায়িত নিষিক্ত কোষ পাঠানোই বেশি যুক্তিসঙ্গত হবে। গন্তব্যে পৌঁছানোর পর সেগুলো থেকে জন্ম নেবে মানুষ। এতে করে নতুন গ্রহে তাৎক্ষণিকভাবে এক দল অধিবাসী পাওয়া যাবে। বিপুল পরিমাণ বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘ সময় ধরে পরিবহনের ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হবে না।

আরেকটি বিষয়: আমাদেরকে ধরে নিতে হচ্ছে, এই দীর্ঘ সময়ে অনেক কিছু হওয়া সম্ভব। ফলে ভবিষ্যতে বসতি গাঁড়া মানুষগুলো যে চেহারা-সুরত বা মানসিকতায় যে মানুষের মতোই হবে সেটা ভাবারও কোনো কারণ নেই। যদি মানুষকে প্রয়োজন অনুসারে বদলে নেওয়া নেওয়া যায়, তাহলে প্রতিটি অভিযানেই প্রস্তাবিত নকশা অনুসারে প্রাণী বানিয়ে নেওয়া যায়। যাতে থাকে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শরীর ও মনের সমন্বয়।

বসতিস্থাপনকারীদেরকে সাধারণ সংজ্ঞার জীবিত প্রাণীও হতে হবে না। এখনই মানুষের মধ্যে সিলিকন-চিপের মাইক্রোপ্রসেসর স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে। এই প্রযুক্তি আরও উন্নত হলে জৈব ও কৃত্রিম বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশের মিশ্রণহতেই পারে। যাতে করে শারীরবৃত্তিক কাজের পাশপাশি মস্তিষ্কও ঠিকভাবে কাজ করবে। যেমন ধরুন, মানুষের মস্তিষ্কের জন্যে বোল্ট-অন স্মৃতি তৈরি করা যেতে পারে। অনেকটা কম্পিউটারের যেভাবে অতিরিক্ত মেমোরি লাগানো হয়। উল্টোভাবে আবার এমনও হতে পারে যে জৈব পদার্থর জন্যে যন্ত্রাংশ তৈরির চেয়ে হিসাব-নিকাশ করার প্রতি অভ্যস্ত হওয়া বেশি কার্যকরী হবে। তার মানে কম্পিউটারের যন্ত্রাংশগুলোকে জৈব উপায়ে বিকশিত করা যাবে। ডিজিটাল কম্পিউটারের বদলে নিউরাল নেট চলে আসার সম্ভাবনা আরও বেশি। এমনকি এখনই ডিজিটাল কম্পিউটারের নিউরাল নেট ব্যবহার করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে উদ্দীপিত করা হচ্ছে। পূর্বানুমান করা হচ্ছে অর্থনৈতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের আচরণ। মস্তিষ্কের টিস্যুর একটি অংশ নিয়ে তা দিয়ে শুরু থেকেই জৈব নিউরাল নেট বানানোটাই হয়ত আরও বেশি অর্থপূর্ণ হবে। জৈব ও কৃত্রিম নেতওয়ার্কের একটি বন্ধন তৈরি হবে খুবই যুক্তিসঙ্গত। ন্যানোপ্রযুক্তির আবির্ভাবের সাথে সাথে জীবিত ও মৃত, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম, মস্তিষ্ক ও কম্পিউটারের পার্থক্য ক্রমেই ছোট হয়ে আসবে।

বর্তমানে এসব অনুমান বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিতেই শুধু পাওয়া যায়। এগুলোকে বৈজ্ঞানিক বাস্তবে পরিণত হতে পারে?আর যাই হোক, আমরা কোনো কিছু অনুমান করতে পারি বলেই যে সেটা সত্যি হয়ে যাবে এমন কোনো কথা নেই। তবে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা যেমন নীতি প্রয়োগ করেছি সেটা করতে পারি প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও।যথেষ্ট বেশি সময় পাওয়া গেলে যা যা ঘটতে পারে তার সবই ঘটবে। যদি মানুষ বা তাদের বংশধররা যথেষ্ট উৎসাহী থাকে (এটা হয়ত অনেক যদি-কিন্তুর ব্যাপার), তাহলে পদার্থবিদ্যার সূত্র ছাড়া আর কিছুই প্রযুক্তিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এক প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের জন্য মানব জিনোম প্রকল্প কষ্টসাধ্য এক কাজ। কিন্তু শত শত, হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ প্রজন্ম এই কাজ করতে থাকলে কাজটি হয়ে যাবে অনায়াসেই।

আশাবাদীই হওয়া যাক। ধরুন আমরা বেঁচে যাব। আর আমাদের প্রযুক্তির উন্নয়ন সর্বোচ্চ শিখরে যেতে থাকবে। মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা কী হবে? ধরুন, উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বুদ্ধিমান জীব বানানো সম্ভব হলো। এর ফলে এখন যেসব বৈরি জায়গায় প্রতিনিধি পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না সেখানেও সেটা করা যাবে। এই প্রাণীগুলো মনুষ্য-নির্মিত প্রযুক্তিরই ফসল হলেও এরা নিজেরা কিন্তু মানুষ হবে না।

এই অদ্ভুত প্রাণীগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের কি চিন্তিত হওয়া উচিত? মানুষের বদলে এ ধরনের দানব চলে আসতে পারে ভাবলেই অনেকের মধ্যে বিরক্তি কাজ করে। টিকে থাকার জন্য জিনপ্রকৌশলের মাধ্যমে নির্মিত জৈব রোবটের কাছে জায়গা ছেড়ে দিতে হলে হয়ত দেওয়াই উচিত। তবুও মানুষের অবসান যদি আমাদেরকে হতাশ করে, তাহলে আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত আমরা মানুষের ঠিক কোন জিনিসটি সংরক্ষণ করতে চাই। অবশ্যই আমাদের শারীরিক আকৃতি নয়। আজ থেকে ১০ লক্ষ বছর পরে আমাদের বংশধরদের পায়ের আঙ্গুল নাও থাকতে পারে শুনলে কি আমাদের খারাপ লাগবে? বা পা ছোট হয়ে গেলে? কিংবা মাথা বা মস্তিষ্ক বড় হয়ে গেলে? আমাদের শারীরিক আকৃতি তো গত কয়েক শতাব্দীতে অনেক পাল্টেছে। এখনও বিভিন্ন গোত্রের মানুষের মধ্যে ব্যাপক বৈচিত্র্য আছে।

আমার মনে হয়, কিছু একটা বলতে বললে বেশিরভাগ মানুষ মানবিক চেতনাকে গুরুত্ব দেবে। আমাদের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, স্বতন্ত্র মানসিক গঠন ইত্যাদি। আমাদের শৈল্পিক, বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জনের ক্ষেত্রে এমনটাই দেখা গেছে। এই জিনিসগুলো অবশ্যই সংরক্ষণ করে রাখার মতো। আমরা আমাদের বংশধরদের কাছে মানবিকতা রেখে যাওয়া নিশ্চিত করতে পারলে শারীরিক আকৃতিতে কী এসে যায়? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা তো অর্জিত হচ্ছেই।

মহাশূন্যময় ঘুরে বেড়ানো মানুষের মতো প্রাণী তৈরি করা সম্ভব কি না সেটা বড়সড় অনুমান না করে বলার উপায় নেই। অন্য কিছু না হলেও এটা হতে পারে যে মানুষ এত বড় কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দীপনাটুকু হারিয়ে ফেলবে। অথবা অর্থনৈতিক, পরিবেশগত বা অন্য কোনো দূর্যোগের ফলে এই গ্রহটিকে ছেড়ে যাবার ঐকান্তিক ইচ্ছা বাস্তবায়নের আগেই আমাদের মৃত্যু ঘটবে। আবার এও হতে পারে, পৃথিবীর বাইরের বুদ্ধিমান প্রাণীরা আমাদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেছে। বাসযোগ্য বেশির ভাগ গ্রহই হয়ত ওরা দখল করে ফেলেছে (তবে অবশ্যই পৃথিবীকে দখল করতে পারেনি)। তবে পুরো মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে প্রযুক্তির সাহায্যে তা নিয়ন্ত্রণ করার কাজটি কি আমাদের কোনো বংশধর করবে নাকি কোনো ভিনগ্রহের প্রাণীরা করবে সেটা বলা যাচ্ছে না। আবার ধীরগতিতে মহাবিশ্বের বিনাশকে এমন উন্নত প্রজাতি কীভাবে মোকাবেলা করবে সে প্রশ্নও মাথায় আসা স্বাভাবিক।

সপ্তম অধ্যায়েই বলেছি, মহাবিশ্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হবে অত্যন্ত ধীরগতিতে। ফলে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার ওপর ভিত্তি করে বহু দূরের ভবিষ্যতের প্রযুক্তি কেমন হবে সেটা অনুমান করা অর্থহীন। এক লক্ষ কোটি বছর একটি প্রযুক্তিগত সমাজের কথা তো চিন্তা করাও কঠিন। মনে হতে পারে, তারা যেকোনো কিছু অর্জন করতে পারবে। কিন্তু একটি প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক, তাকে পদার্থবিদ্যার মৌলিক সূত্রগুলো মানতেই হবে। যেমন ধরুন, আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সঠিক। কোনোকিছুই আলোর চেয়ে বেশি বেগে যেতে পারে না। ফলে লক্ষ কোটি বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে গেলেও আলোর বেগের এই বাধা পার হওয়া সম্ভব হবে না। আরও গুরত্বপূর্ণ কথা হলো, ভাল কিছু করতে গেলেই কিছু না কিছু শক্তি ব্যয় হয়। ফলে মহাবিশ্বের মুক্ত শক্তির উৎস ক্রমেই খালি হয়ে যাচ্ছে। যা প্রযুক্তি সমাজের জন্য এক বিরাট সমস্যা। সে যত উন্নত সভ্যতাই হোক না কেন।

সর্বোচ্চ শ্রেণীর বুদ্ধিমান জীবের ক্ষেত্রে মৌলিক প্রাকৃতিক নীতিগুলো প্রয়োগ করে আমরা যাচাই করতে পারি, মহাবিশ্বের ক্ষয়ের ফলে দূর ভবিষ্যতে প্রাণীদের টিকে থাকতে সত্যিকারের মৌলিক কোনোই সমস্যা হবে কি না। একটি জীবকে বুদ্ধিমান হতে হলে একে অন্তত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করতে পারতেই হবে। এর জন্যে মহাবিশ্বের ভৌত অবস্থাকে কেমন হতে হবে তা জানা দরকার।

তথ্য প্রক্রিয়াকরণের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে শক্তি খরচ হয়। এ কারণেই যে ওয়ার্ড প্রসেসরে আমি এই বইটি টাইপ করছি সেটি প্রধান বৈদ্যতিক সরবরাহের সাথে যুক্ত আছে। প্রতি বিট তথ্যের জন্যে কী পরিমাণ শক্তি খরচ হবে সেটা নির্ভর করে তাপগতীয় প্রক্রিয়ার ওপর। প্রসেসরের পরিবেশের তাপমাত্রার কাছাকাছি তাপমাত্রায় কাজ করলে খরচ হয় সবচেয়ে কম। মানুষের মস্তিষ্ক ও বেশিরভাগ কম্পিউটারের কর্মদক্ষতা খুবই কম। তাপ আকারে বেরিয়ে যায় প্রচুর পরিমাণ বাড়তি শক্তি।

উদাহরণস্বরূপ, দেহের তাপের বড় একটি অংশ মস্তিষ্কই তৈরি করে। গলে যাওয়া থেকে বাঁচাতে অনেক কম্পিউটারেই শীতলীকরণ ব্যবস্থা রাখতে হয়। এই তাপ অপচয়ের মূল কারণ খুঁজলে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কৌশলটাই পাওয়া যাবে। ঠিক এই কারণেই আবার তথ্য হারিয়েও যায়। যেমন ধরুন একটি কম্পিয়টার দিয়ে হিসাব করা হলো ১ +২ = ৩। তাহলে দুই বিট তথ্য (১ ও ২) সরিয়ে এক বিট তথ্য (৩) পাওয়া গেল। হিসাব শেষ হওয়ার পরে কম্পিউটার আগের তথ্য ফেলে দিতে পারে। ফলে দুই বিটের বদলে এক বিট তথ্য থাকল। সত্যি বলতে, কম্পিউটারের মেমোরির চাপ কমাতে এ ধরনের বাড়তি তথ্য সবসময়ই ফেলে দিতে হয়। সংজ্ঞানুসারেই মুছে ফেলার এই প্রক্রিয়া অফেরতযোগ্য। এর ফলে কিন্তু বেড়ে যায় এনট্রপি৩। ফলে বোঝা যাচ্ছে, একেবারে মৌলিক কারণে তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের কারণে অনিবার্য ও অফেরতযোগ্য উপায়ে বিদ্যমান শক্তি কমে যাচ্ছে। আর বাড়ছে মহাবিশ্বের এনট্রপি।

মহাবিশ্ব শীতল হতে হতে তাপীয় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেলে বুদ্ধিমান জীবরা কী কী অসুবিধার সম্মুখীন হবে তা নিয়ে ফ্রিম্যান ডাইসন ভেবেছেন। শুধু চিন্তা করার জন্যেও এই জীবদেরকে একটি নির্দিষ্ট হারে শক্তি খরচ করতে হয়। প্রথম অসুবিধা হোল জীবদের তাপমাত্রা পরিবেশের তাপমাত্রার চেয়ে বেশি হতে হবে। তা না হলে অতিরিক্ত তাপ তাদের শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, একটি ভৌত ব্যবস্থা কী হারে পরিবেশে শক্তি বিকীর্ণ করবে তা পদার্থবিদ্যার সূত্র মেনে চলতে বাধ্য। সহজেই বোঝা যাচ্ছে, জীবরা যে হারে অতিরিক্ত তাপ থেকে মুক্ত হবে তার চেয়ে বেশি হারে সে ধরনের তাপ শরীরে তৈরি হলে বেশি দিন বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না। ফলে কী হারে তাপ খরচ হবে তার একটি নিম্নসীমা নির্ধারিত হয়েই যাচ্ছে। ফলে একটি অনিবার্য প্রয়োজন হলো, শক্তির মুক্ত একটি উৎস থাকতেই হবে। যাতে তাপের এই প্রবাহ অবিরাম চলতে পারে। ডাইসনের মতে মহাবিশ্বের দূর ভবিষ্যতে এ ধরনের সকল উৎসই নিঃশেষ হয়ে যাবে। তার মানে সকল বুদ্ধিমান জীবই একসময় শক্তির সঙ্কটের মুখে পড়বে।

এখন, বুদ্ধিমান জীবরা দুই উপায়ে আয়ু বাড়াতে পারে। একটি হলো, যতদিন সম্ভব বেঁচে থাকা। আরেকটি হলো, চিন্তা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের হার বাড়ানো। ডাইসন এক্ষেত্রে একটি যৌক্তিক অনুমান করেছেন। একটি জীবের জন্যে সময় অতিবাহিত হওয়ার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ঐ জীবের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের হারের ওপর নির্ভর করে। পক্রিয়া যত দ্রুত চলবে, একক সময়ে তত দ্রুত চিন্তা ও অনুভূতি সম্পন্ন হবে। সময়ও তত দ্রুত চলবে বলে মনে হবে। রবার্ট ফোরওয়ার্ডের *ড্রাগন'স এগ* সায়েন্স ফিকশনে এই অনুমান বেশ রসাত্মকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে এক দল বুদ্ধিমান জীবের গল্প বলা হয়েছে। এরা বাস করে একটি নিউট্রন নক্ষত্রের পৃষ্ঠে। অস্তিত্ব্ব টিকিয়ে রাখতে এরা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বদলে নিউক্লীয় প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে। এরা তথ্য প্রসেস করে অনেক দ্রুত। মানুষ এক সেকেন্ডে যা করে, তারা সেই সময়ে বহু বছরের কাজ করে ফেলে। মানুষের সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময় তারা বেশ আদিম ছিল। কিন্তু মিনিটের মধ্যে তারা পরিস্থিতি বুঝে ফেলে ও মানুষকে পরাজিত করে।

দূর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, দূর ভবিষ্যতে বেঁচে থাকার জন্যে এই কৌশল গ্রহণ করলে অসুবিধা আছে। তথ্য যত দ্রুত প্রসেস হবে, শক্তি খরচের হারও তত দ্রুত হবে। শক্তির যোগানও তত দ্রুত খালি হয়ে। হয়ত ভাবছেন, এর ফেল আমাদের বংশধররা তো তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। সে তাদের দৈহিক আকৃতি যাই হোক না কেন। কিন্তু সেটা নাও হতে পারে। ডাইসন দেখিয়েছেন, একটি কৌশল করে দুটোর মধ্যে সমন্বয় করা যাবে। মহাবিশ্বের ক্ষয়ের সাথে ভারসাম্য রক্ষা করতে প্রাণীরা তাদের কর্মকাণ্ডের হার আস্তে আস্তে কমিয়ে আনবে। যেমন ধরুন, ক্রমেই বেশি সময়ের জন্যে তারা শীতনিদ্রায় অবস্থান করবে। প্রতিটি শীতনিদ্রার সময় আগের সক্রিয় মেয়াদের কাজের ফলে সৃষ্ট তাপ বেরিয়ে যাবে। আর জমা হবে প্রয়োজনীয় শক্তি। যা ব্যবহার করা যাবে পরের সক্রিয় মেয়াদে।

এই কৌশল গ্রহণ করা জীবদের অতিবাহিত সময় সত্যিকার সময়ের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশ হতে থাকবে। কারণ এদের নিষ্ক্রিয় অবস্থা ক্রমেই বড় হতে থাকবে। কিন্তু আমি অনেকক্ষণ ধরেই বলছি, চিরকাল একটি দীর্ঘ সময়। ফলে বিপরীতমুখী দুটি স্রোতের মাঝে আমরা বাঁধা। সম্পদ ক্রমেই ফুরিয়ে যাবে। আর সময় ক্রমেই বেড়ে চলবে অসীমের দিকে। এই সীমাগুলোকে সরল উপায়ে পরীক্ষা করে ডাইসন দেখেছেন, মোট সম্পদের পরিমাণ সসীম হলেও মোট আপেক্ষিক সময় অসীম হতে পারে। তিনি অসাধারণ একটি তথ্য দিয়েছেন। বর্তমানে পৃথিবীতে যত মানুষ আছে এত সংখ্যক জীব ৬×১০৩০ জুল শক্তি দিয়েই আক্ষরিক অর্থে অনন্তকাল বাঁচতে পারবে। সূর্য আট ঘণ্টা জ্বললেই এই পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়।

তবে সত্যিকারের অমরত্ব পেতে হলে অসীম পরিমাণ তথ্য প্রসেস করতে পারলেই চলবে না। একটি জীবের মস্তিষ্কের অবস্থার সংখ্যা সসীম হলে সে শুধু সসীম সংখ্যক আলাদা চিন্তা করতে পারবে। চিরকাল বেঁচে থাকতে হলে একই চিন্তাই অনেকবার করতে হবে। এ ধরনের বেঁচে থাকাকে ধ্বংসপ্রাপ্ত এক প্রজাতির মতোই অর্থহীন মনে হয়। এটা থেকে বাঁচতে চাইলে ঐ সম্প্রদায় বা মহাপ্রাণীটাকে ক্রমশ বড় হতে থাকতে হবে। অনেক দূরের ভবিষ্যতে এটা করতে যাওয়া অনেক কঠিন কাজ হবে। কারণ বস্তুকে যে গতিতে মস্তিষ্কের অংশ বানানো যাবে তার চেয়ে বেশি গতিতে বস্তু বাষ্পীভূত হয়ে যাবে। বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের পরিধি বাড়িয়ে নিতে বেপরোয়া ও বিচক্ষণ কোনো জীব হয়ত সবসময় হাতের সামনে পড়ে থাকা দূর্লভ্য (চেক বানান) মহাজাগতিক নিউট্রিনো থেকে শক্তি আহরণ করবে।

ডাইসনের কথাবার্তার অনেকাংশ জুড়েই ভেতরে ভেতরে ধরে নেওয়া হয়েছে, এই সকল জীবদের মানসিক চিন্তার গতি ডিজিটাল কম্পিউটারের হিসাবের গতির সমান হয়ে যাবে। দূর ভবিষ্যতের জীবদের ভবিষ্যৎ নিয়ে করা বিভিন্ন অনুমানেও আসলে তাই ধরে নেওয়া হয়। ডিজিটাল কম্পিউটার অবশ্যই সসীম অবস্থাসম্পন্ন একটি মেশিন। ফলে এর কাজের সম্ভাব্য পরিধি সীমিত। তবে অ্যানালগ কম্পিউটার নামে অন্য ধরনের যন্ত্রও আছে। ডিজিটাল কম্পিউটারের কিছু সীমাবদ্ধতা অ্যানালগ কম্পিউটারে নেই। ডিজিটাল কম্পিউটার শুধু সসীম পরিমাণ তথ্য জমা ও প্রসেস করতে পারে। ধরুন, অ্যানালগ কম্পিউটারের মতো করে তথ্য এনকোড করা হলো। ধরুন যে জড় বস্তুর কোণের অবস্থানের মাধ্যমে সেটা করা হলো। এক্ষেত্রে কম্পিউটারের ধারণক্ষমতাকে অসীম মনে হবে। ফলে, একটি মহাপ্রাণী অ্যানালগ কম্পিউটারের মতো করে কাজ করতে পারলে এটি শুধু অসীমসংখ্যক চিন্তাই করতে পারবে না, হয়ত অসীমসংখ্যক আলাদা চিন্তাও করতে পারবে।

কিন্তু সার্বিকভাবে মহাবিশ্ব অ্যানালগ নাকি ডিজিটাল কম্পিউটারের মতো সেটা আমরা জানি না। কোয়ান্টাম ফিজিক্স বলছে, মহাবিশ্ব নিজেও কোয়ান্টায়িত বা ছিন্নায়িত। মানে অংশে অংশে বিভক্ত। অর্থাৎ, এটি নিরবিচ্ছিন্ন তারতম্যের বদলে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন অংশে সবগুলো বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে। তবে এটি শুধুই একটি ধারণা। আমরা মানসিক ও জড় মস্তিষ্কের মধ্যকার সম্পর্কও সঠিকভাবে বুঝি না। আমরা তো এখানে কোয়ান্টাম ফিজিক্সের ধারণা নিয়ে কথা বললাম। তার সাথে চিন্তা ও অভিজ্ঞতাগুলোর সম্পর্ক নাও তো থাকতে পারে।

তবে মন যেমনই হোক না কেন, দূর ভবিষ্যতের জীবরা যে শেষ পর্যন্ত জ্বালানির সঙ্কটে পড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মহাবিশ্বের সব শক্তি একদিন নিঃশেষ হবেই। তবুও এটাকে মোকাবেলা করে তারা এক ধরনের অমরত্ব লাভ করতে পারে। ডাইসনের তুলে ধরা চিত্রে জীবদের প্রয়োজনের প্রতি মহাবিশ্বের কোনো নজরই থাকবে না। তাদের কর্মকাণ্ডও মহাবিশ্বকে ক্রমাগত কম প্রভাবিত করতে থাকবে। অপরিসীম সময় ধরে জীবরা থাকবে নিষ্ক্রিয়। স্মৃতি থাকবে। কিন্তু স্মৃতিতে নতুন কিছু যুক্ত হবে না। মুমূর্ষু মহাবিশ্বের স্থির অন্ধকারে হবে উঠবে না কোনো আলোড়ন। একটু বুদ্ধি খরচ করে ওরা হয়ত এখনও অসীমসংখ্যক চিন্তা করতে পারবে। অসীমসংখ্যক অভিজ্ঞতার সাধ নিতে পারবে। আর কী ই বা আশা করার আছে?

বর্তমান সময়ে দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসা অন্যতম ভুল ধারণা হলো মহাজাগতিক তাপীয় মৃত্যু। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে আপাতদৃষ্টিতে মহাবিশ্ব এক সময় এর বৈশিষ্ট্যগুলো হারিয়ে ফেলবে। রাসেল ও আরও কেউ কেউ এই ধারণাকে ব্যবহার করে নাস্তিকতা, নাস্তিবাদ (nihilism) ও হতাশার দর্শন প্রমাণে ব্যস্ত হয়েছেন। বর্তমানে আমাদের কসমোলজির জ্ঞান আরও উন্নত হয়েছে। এখন আমরা একটু ভিন্ন চিত্র দেখছি। মহাবিশ্ব হয়ত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এর উপাদান শেষ হয়ে যাচ্ছে না। হ্যাঁ, তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের প্রয়োগ ঘটছে। কিন্তু এর কারণে সংস্কৃতির মৃত্যু ঘটবে বলার উপায় নেই।

আসলে ডাইসন যেমন বলেছেন, বাস্তবে পরিস্থিতি এতটা খারাপ নাও হতে পারে। এতক্ষণ পর্যন্ত আমি ধরে নিয়েছি, প্রসারিত ও শীতল হতে হতেও মহাবিশ্ব কম-বেশি সুষম (একই রকম) থাকে। কিন্তু এটা ভুলও হতে পারে। মহাকর্ষ বহু রকম অস্থিতিশীলতার জন্ম দেয়। বর্তমানে বড় স্কেলে চিন্তা করলে আমরা মহাবিশ্বকে সুষম বা সব দিকে একইরকম দেখি। দূর ভবিষ্যতে হয়ত সেটি আরও জটিল কোনোদীকে মোড় নিতে পারে। যেমন ধরুন, আলাদা দিকে প্রসারণের হার সামান্য তারতম্যের ফল বড় হয়ে দেখা দিতে পারে। বড় বড় ব্ল্যাকহোলরা নিজেদের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের মাধ্যমে মহাজাগতিক প্রসারণের প্রভাব উপেক্ষা করে একীভূত হয়ে যেতে পারে। এই অবস্থার কারণে একটি দারুণ লড়াই বাঁধবে। মনে করে দেখুন, একটি ব্ল্যাকহোল যত ছোট হবে, এর তাপমাত্রা তত বেশি। এটি বাষ্পীভূতও হয়ে যায় তত তাড়াতাড়ি। দুটো ব্ল্যাকহোল মিলিত হলে সমন্বিত ব্ল্যাকহোলটি আকারে বড় হবে। তার মানে এর তাপমাত্রা হবে কম। ফলে এর বাষ্পীভবন বড় একটি সমস্যার মুখে পড়বে। তাহলে, দূর ভবিষ্যতের মহাবিশ্ব সম্পর্কে মূল প্রশ্ন হলো, ব্ল্যাকহোলদের একীভবন তাদের বষ্পীভবন ঠেকাতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারবে কি না। যটি পারে, তাহলে সবসময়ই কিছু ব্ল্যাকহোল হকিং বিকিরণের মাধ্যমে জ্বালানি সরবরাহ করতে পারবে। উন্নত প্রযুক্তির কোনো জাতি সেই জ্বালানি ব্যবহার করে হয়ত শীতনিদ্রার প্রয়োজন থেকে মুক্তি পাবে। পদার্থবিদ ডন পেইজ ও র‍্যান্ডাল ম্যাককির হিসাব অনুসারে প্রসারণ ও সঙ্কোচনের প্রভাব উনিশ-বিশ হবে। মহাবিশ্বের প্রসারণ হার কী হারে কমবে সেটার ওপর এই লড়াইয়ের ফলাফল খুব বেশি নির্ভর করছে। কোনো কোনো নমুনা অনুসারে ব্ল্যাকহোলদের একীভবনই জয়ই হয়।

ডাইসনের বিবরণে আরও একটি বিষয়ও মাথায় রাখা হয়নি। এমনও তো হতে পারে যে নিজেদের আয়ু বাড়ানোর আমাদের বংশধররা মহাবিশ্বের বড় স্কেলের কাঠামো পাল্টে ফেলার চেষ্টা করতে পারে। জ্যোতির্পদার্থবিদ জন ব্যারো ও ফ্র্যাংক টিপলার এমন কিছু উপায় নিয়ে ভেবেছেন। উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন কোনো সম্প্রদায় হয়ত নিজেদের জন্যে অনুকূল কোনো মহাকর্ষীয় বিন্যাস তৈরি করতে নক্ষত্রের চলাচলে সামান্য পরিবর্তন ঘটাতে পারে। যেমন ধরুন, নিউক্লীয় অস্ত্র ব্যবহার করে গ্রহাণুর কক্ষপথ পাল্টে ফেলা যাবে। এর মাধ্যমে এটি কোনো গ্রহের মহাকর্ষীয় শক্তি অর্জন করে সূর্যে গিয়ে ধাক্কা লাগাতে পারবে। এই ধাক্কার ফলে ছায়াপথে সূর্যের কক্ষপথ সামান্য পাল্টে যাবে। এই প্রভাব ছোট। কিন্তু ধীরে ধীরে এর ফলাফল লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠবে। সূর্য যত দূরে সরবে, ততই দ্রুত দূরে সরতে থাকবে। বহু আলোকবর্ষের মতো দূরত্বে এই স্থানচ্যুতির ফলে সূর্য অন্য কোনো নক্ষত্রের কাছাকাছি চলে বড় ঘটনা দেখা যেতে পারে। হালকা একটি ধাক্কা থেকে হয়ত ছায়াপথে সূর্যের গতিপথে চলে আসবে আমূল পরিবর্তন। অনেকগুলো নক্ষত্রের গতিপথ পাল্টালে নানান রকমের মহাজাগতিক বস্তু তৈরি করা যাবে। ব্যবহার করা যাবে জাতির কল্যাণে। আর ফলাফল ক্রমেই বড় হয়ে যায় বলে এর মাধ্যমে এখানে-সেখানে এক-আধটু পরিবর্তন করে করে যেকোনো আকারে ব্যবস্থাকেই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। যথেষ দীর্ঘ সময় পেলে আমাদের বংশধররা নিজেদের জন্যে প্রচুর সময় হাতে পাবে। পুরো ছায়াপথও এভাবে দখলে আনা যেতে পারে।

বড় আকারের এই মহাজাগতিক কলাকৌশলগুলোকে প্রাকৃতিক ও দৈব ঘটনার সাথে লড়াই করতে হবে। সপ্তম অধ্যায়েই বলা হয়েছে, নক্ষত্র ও ছায়াপথরা মহাকর্ষীয় বন্ধনে আবদ্ধ গুচ্ছ থেকে ছিটকে পড়তে থাকবে। ব্যারো ও টিপলার দেখেছেন, গ্রহাণুকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একটি ছায়াপথকে পুনর্বিন্যাস করতে ১০২২ বছর সময় লাগবে। কিন্তু প্রাকৃতিক দূর্ঘটনা ১০১৯ বছরের মধ্যেই ঘটে। তার মানে দেখা যাচ্ছে, লড়াইয়ের ফল চলে যাচ্ছে প্রকৃতির পক্ষে। অন্য দিকে, আমাদের বংশধররা হয়ত গ্রহাণুর চেয়ে বড় আকারের জিনিসকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। এছাড়াও এই প্রক্রিয়াগুলো বস্তুগুলোর কক্ষপথের বেগের ওপরও নির্ভর করে। আমরা পুরো ছায়াপথ নিয়ে ভাবলে দেখব, মহাবিশ্বের প্রসারণের সাথে সাথে এই বেগগুলো কমে আসে। ফলে এগুলোকে কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেও সময় বেশি লেগে যাবে। তবে দুটো প্রভাব একই হারে কমবে না। দেখে মনে হচ্ছে, সময়ের সাথে সাথে প্রাকৃতিক দূর্ঘটনার হার মহাবিশ্বকে পুনির্বিন্যাস করার হারের পেছনে পড়ে যাবে। এতে করে দারুণ একটি সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। ক্রমেই সম্পদ ফুরিয়ে যেতে থাকা মহাবিশ্বের ওপর বুদ্ধিমান জীবদের নিয়ন্ত্রণও ক্রমেই বারতে থাকবে। একটা সময় পুরো প্রকৃতি চলে আসবে প্রযুক্তির আওতায়। প্রাকৃতিক আর কৃত্রিম জিনিসের মধ্যে পার্থক্যই আর থাকবে না।

ডাইসনের বিশ্লেষণের আরেকটি বড় অনুমান হলো, চিন্তা করতে গেলে শক্তি খরচ হবেই। মানুষের চিন্তন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সত্যি। কয়েকদিন আগ পর্যন্তও ধরে নেওয়া হত, যেকোনো রকম তথ্য প্রসেস করতে গেলেই একটি ন্যূনতম পরিমাণ তাপগতীয় মূল্য দিতেই হয়। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এটা সবসময় সত্য নয়। কম্পিউটার বিজ্ঞানী চার্লস বেনেট ও রোলফ র‍্যানডৌর দেখিয়েছেন, নীতিগতভাবে প্রত্যাগামী (বিপরীত দিকেও কাজ করতে সক্ষম) হিসাবও সম্ভব। এর অর্থ হলো, কিছু কিছু ভৌত ব্যবস্থা অপচয় ছাড়াও তথ্য প্রসেস করতে পারে (বিষয়টি এখনও বাস্তবে করা সম্ভব হয়নি)। এমন একটি সিস্টেমের কথা চিন্তা করা যেতে পারে, যেটি কোনো ধরনের বিদ্যুৎ সংযোগের প্রয়োজন ছাড়াই অসীমসংখ্যক চিন্তা সম্পন্ন করতে পারবে। এটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না যে এ ধরনের একটি সিস্টেম কি একই সাথে তথ্য সংগ্রহ ও প্রসেস করতে পারবে কি না। কারণ পরিবেশ থেকে কোনো অশূন্য তথ্য নিতে গেলে কোনো না কোনো ভাবে শক্তি অপচয় হতে দেখা যায়ই। কারণ গোলমেলে শব্দ থেকে বের করে নিতে হয় সঠিক সঙ্কেত। ফলে বাইরের জগত সম্পর্কে এই সরল জীবের কোনো ধারণা থাকবে না। তবে অতীতের মহাবিশ্বের কথা তাদের মনে থাকবে। সেই জীব আবার স্বপ্নও দেখতে পারবে হয়ত।

এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের মৃত্যু প্রক্রিয়া নিয়ে নিবিড়ভাবে কাজ করছেন। এনট্রপির মাধ্যমে সৃষ্ট অপচয়ের মাধ্যমে আমাদের বাসস্থান মহাবিশ্ব যে নির্দিষ্ট হারে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে সেটি বিজ্ঞান মহলের একটি সাধারণ বিশ্বাস। কিন্তু এই বিশ্বাস কতটা প্রতিষ্ঠিত? আমি কি নিশ্চিত করে বলতে পারি সব ভৌত প্রক্রিয়া অনিবার্যভাবে বিশৃঙ্খলা ও ক্ষয়ের জন্ম দেয়?

জীববিদ্যা কী বলে? যে জোরালোভাবে কিছু জীববিজ্ঞানী ডারউইনীয় বিবর্তনকে সমর্থন করেন সেখান থেকে কিছু সূত্র পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, ভৌত বলের মাধ্যমে পরিচালিত যে প্রক্রিয়াটি মৌলিকভাবে সুস্পষ্টভাবে ধ্বংসাত্মক হওয়ার কথা সেটি গঠনমূলক হওয়ার কারণে অস্বস্তিবোধ করার কারণেই তারা এই মতে বিশ্বাসী হয়েছেন। সম্ভবত পৃথিবীতে প্রাণের সূচনা ঘটেছে আদিম আঠালো কাদা থেকে। বর্তমান প্রাণীজগৎ বিশাল ও জটিল বাস্তুসংস্তানের অংশ। একটি জটিল ও অত্যন্ত বৈচিত্র্যে ভরপুর এক বিশাল জালে অণুজীবরা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করছে। জীববিজ্ঞানীরা অবশ্য বিবর্তনে র নিয়মতান্ত্রিক অগ্রগতির পক্ষের যেকোনো প্রমাণকে অস্বীকার করেন। হয়ত সেটা করেন ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য প্রকাশ পাওয়ার ভয়ে। তবে বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষ সবাই ভাল করেই জানেন, পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভবের পর থেকে কম-বেশি একই দিক বরাবর কিছু একটার উন্নতি ঘটেছে। সেই উন্নতিকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করাই হলো সমস্যার কাজ। ঠিক কোন জিনিসটি উন্নত হয়েছে।

টিকে থাকা সম্পর্কিত এতক্ষণের আলোচনায় তথ্য (বা শৃঙ্খলা) ও এনট্রপির মধ্যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেখা গেছে, এনট্রপিই সবসময় জয়ী হয়। কিন্তু তথ্যই কি সেই জিনিস যেটা নিয়ে আমাদের চিন্তিত হওয়া উচিত? আর যাই হোক, সম্ভাব্য সবরকম চিন্তা নিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করা ফোনবুক পড়ার মতোই রোমাঞ্চকর কাজ। অভিজ্ঞতার মানই হলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আরও সার্বিকভাবে বললে সংগৃহীত ও ব্যবহৃত তথ্যের মান।

আমরা যত দূর জানি, কম-বেশি বৈশিষ্ট্যহীন অবস্থায় মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে এসেছে সমৃদ্ধি ও ভৌত ব্যবস্থার বৈচিত্র্য। তার মানে মহাবিশ্বের ইতিহাস আসলে সংগঠিত জটিলতা তৈরির ইতিহাস। শুনে একে প্যারাডক্স মনে হয়। আলোচনার শুরুতেই বলেছিলাম, তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে মহাবিশ্বের মৃত্যু হচ্ছে। এটি প্রাথমিক সময়ের নিম্ন এনট্রপির অবস্থা থেকে সর্বোচ্চ এনট্রপির চূড়ান্ত অবস্থার দিকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু হচ্ছে সম্ভাবনাগুলোর। তাহলে পরিস্থিতি ভাল হচ্ছে নাকি খারাপ হচ্ছে?

আসলে কিন্তু কোনো প্যারাডক্স নেই। কারণ সংগঠিত জটিলতা এনট্রপি থেকে ভিন্ন জিনিস। এনট্রপি না বিশৃঙ্খলা হলো ঋণাত্মক তথ্য বা শৃঙ্খলা। আপনি যত বেশি তথ্য ব্যবহার করবেন, মানে যত বেশি বিন্যাস তৈরি করবেন, তত বেশি এনট্রপি তৈরি হয়ে যাবে। এক জায়গার শৃঙ্খলা অন্য জায়গার বিশৃঙ্খলা বাড়িয়ে দেয়। দ্বিতীয় সূত্রটা এমনই। এনট্রপি সবসময় জয়ী হয়। তবে সংগঠিত হওয়া ও জটিলতা বলতে সবসময় বিন্যাস আর তথ্যকেই বোঝায় না। এগুলো হলো নির্দিষ্ট ধরনের বিন্যাস ও তথ্য। যেমন ধরুন, একটি ব্যাকটেরিয়া ও একটি স্ফটিকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আমরা বুঝতে পারি। দুটোই বিন্যস্ত থাকে। তবে বিন্যস্ত থাকে ভিন্ন উপায়ে। একটি স্ফটিকের জাফরিতে থাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ সুষমতা। দারুণ সুন্দর হলেও কিন্তু ঠিকই বিরক্তিকর। অন্য দিকে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সংগঠিত একটি ব্যাকটেরিয়া দারুণ আকর্ষণীয়।

মনে হবে এই বিষয়গুলো ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে আলাদা হবে। তবে গণিতের মাধ্যমে এগুলোকে শক্ত ভিত্তি দেওয়া যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গবেষণার নতুন একটি শাখার উদ্ভব ঘটেছে। সংগঠিত জটিলতার মতো ধারণাগুলোকে সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করাই এর উদ্দেশ্য। এটি সংগঠিত হওয়ার সাধারণ নীতিমালাও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সেগুলোকে স্থান করে দিতে চায় পদার্থবিজ্ঞানের প্রচলিত নিয়মের পাশে। এই শাখাটি এখনও একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় আছে। কিন্তু বিন্যাস ও বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে প্রথাগত অনেক অনুমানকেই এটি হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে।

আমার *দ্য কসমিক জ্যাকপট* বইয়ে আমি বলেছি, মহাবিশ্বে হয়ত তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয়ত সূত্রের পাশাপাশি এক ধরনের “জটিলতার বর্ধনশীল সূত্র”কাজ করছে। এই দুই সূত্রের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। বাস্তবে একটি ভৌত ব্যবস্থার গঠনগত জটিলতা বাড়লে এনট্রপি বাড়ে। যেমন, জীবের বিবর্তনের ফলে নতুন ও আরও বেশি জটিল প্রাণীর উদ্ভব ঘটে। তবে তার আগে কিন্তু সংঘটিত হয় ধ্বংসাত্মক ভৌত ও জীববৈজ্ঞানিক বিভিন্ন প্রক্রিয়া (যেমন সঠিকভাবে অভিযোজিত হতে না পারা মিউট্যান্টদের অকাল মৃত্যু)। এমনকি তুষারফলক তৈরির সময়ও অপ্রয়োজনীয় তাপ তৈরি হয়। আর এভাবেই বেড়ে চলে মহাবিশ্বের এনট্রপি। তবে আগেই ব্যাখ্যা করেছি, সবসময় যে কোনো কিছু সংগঠিত হলেই এনট্রপি বাড়বে তা নয়। কারণ সংগঠিত হওয়া এনট্রপির বিপরীত নয়।

আমি অত্যন্ত খুশি যে আরও অনেক গবেষক একই সিদ্ধান্তে এসেছেন। জটিলতার “দ্বিতীয় সূত্র”কে প্রতিষ্ঠিত করার একটি চেষ্টাও চলছে। এর সাথে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের কোনো বিরোধ নেই। তবে জটিলতার সূত্রটি মহাজাগতিক পরিবর্তন সম্পর্কে ভিন্ন একটি বিবরণ দিচ্ছে। এটি বলছে, মূলত বৈশিষ্ট্যহীন অবস্থা থেকে মহাবিশ্ব ধীরে ধীরে আরও বিস্তারিত জটিল অবস্থার দিকে এগিয়ে যাবে (এক অর্থে আগে উল্লিখিত গবেষণা অনুসারে সেটি আরও সুকঠিন হবে)।

মহাবিশ্বের শেষ অবস্থার কথা চিন্তা করলে জটিলতার বৃদ্ধি বিষয়ক সূত্রের গুরুত্ব অনেক বেশি। সংগঠিত জটিলতা এনট্রপির বিপরীত না হলে ঋণাত্মক এনট্রপির স্বল্পতার কারণে জটিলতার সীমা বাধাগ্রস্ত হওয়ার কথা নয়। জটিলতা বাড়লে যে এনট্রপি বাড়ে, সেটা হয়ত নিতান্তই ঘটনাক্রমে ঘটে গেছে। এটা হয়ত বিন্যাস্ত হওয়া বা তথ্য প্রসেস করার ক্ষেত্রে যেমন ঘটে তেমন মৌলিক কোনো নিয়ম নয়। এটা সত্য হয়ে থাকলে আমাদের বংশধররা হয়ত ফুরিয়ে আসতে থাকা সম্পদের অপচয় ছাড়াই আরও বেশি সংগঠিত জটিল অবস্থা অর্জন করতে পারবে। হয়ত তারা তাদের ইচ্ছেমতো তথ্য প্রসেস করতে পারবে না। কিন্তু তাদের মানসিক ও শারীরিক কর্মকাণ্ডের সক্ষমতার সমৃদ্ধির অর্জনে কোনো বিধিনিষেধ থাকবে না।

এই অধ্যায় ও সর্বশেষ অধ্যায়ে আমি মহাবিশ্বের গতি ধীর হয়ে যাওয়ার একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তবে গতি ধীর হয়ে গেলেও হয়ত কখনোই গতি থামবে না। আরও বলেছি সায়েন্স ফিকশনের অদ্ভুত প্রাণীদের সামান্য উপকরণ দিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টার গল্প। যেখানে চিরকাল তাদেরকে মুখোমুখি হতে হয় প্রতিকূলতার। তাপগতিবিদ্যার নির্মম দ্বিতীয় সূত্র বিরুদ্ধে তাদেরকে নিজেদের মস্তিষ্কের সৃজনশীলতা প্রদর্শন করতে হবে। টিকে থাকার জন্য তাদেরকে আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে। সে প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হবেই এমনটি বলার জো নেই। তাদের এ অবস্থার কথা ভেবে কোনো কোনো পাঠক হয়ত আনন্দ পাচ্ছেন। কেউবা আবার বিষণ্ণও হচ্ছেন। আমার নিজের প্রতিক্রিয়াটা মিশ্র।

তবে সবকিছুই অনুমান করা হয়েছে এটা ধরে নিয়ে যে মহাবিশ্ব প্রসারিত হতেই থাকবে। আমরা দেখেছি, এটা আসলে নিছকই মহাবিশ্বের অনেকগুলো সম্ভাব্য পরিণতির মধ্যে একটি। প্রসারণ যথেষ্ট দ্রুত হারে কমে গেলে একদিন হয়ত বন্ধই হয়ে যাবে। শুরু হতে পারে সঙ্কোচন। আর ঘটবে এক মহাসঙ্কোচন। সেক্ষেত্রে আমাদের টিকে থাকার সম্ভাবনা কেমন?

অনুবাদকের নোট

১। বইটি ১৯৯০ এর দশকে লেখা হয়েছিল। তবে আলোচ্য বক্তব্য এখনও সত্য।

২। অনেকটা সাপ বা ব্যাঙয়ের শীতনিদ্রার মতো। এতে করে বেঁচে থাকার জন্যে নিয়মিত খাবার গ্রহণের পয়োজন হয় না। সঞ্চিত চর্বি থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাওয়া যায়। এ সময় হৃৎস্পন্দন ও বিপাকের হার কমে যায়।

৩। পদার্থবিদ্যায় এনট্রপি বলতে বোঝায় শক্তি রূপান্তরের অক্ষমতা। অন্য অর্থে এলোমেলো অবস্থার একটি পরিমাপ। যেমন কোনো তাকে অনেক বই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে বলা যাবে গুছিয়ে রাখা কোনো তাকের চেয়ে এর এনট্রপি বেশি। এলোমেলো বইগুলো গোছানো হলে তাকে এনট্রপি কমবে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে মহাবিশ্বের এনট্রপি কখনও কমে না। কারণ, ঐ রুম গোছাতে গেলে মানুষ বা যন্ত্র যে কাজ করবে তাতে সামগ্রিকভাবে এনট্রপি বাড়বেই। ফলে কিছু শক্তি অপচয় হবেই। কিছু শক্তি অরূপান্তরযোগ্য হয়ে যাবেই। আর ইনফরমেশন থিওরিতে এনট্রপি বলতে বোঝায় একটি ঘটনাকে প্রকাশ করতে গড়ে যে পরিমাণ বিট তথ্য প্রয়োজন। তবু দুটো আসলেই একই ধারণার ভিন্ন প্রকাশ।

৪। ডিএনএ এর জিনোম সিকুয়েন্স পাল্টে যাওয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট নতুন জীবকে মিউট্যান্ট বলে।